সহরতলী

সুভাষ বসু

সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতার উপরে লিখিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যতিক্রমী উপন্যাস 'সহরতলী' প্রথম পর্ব ১৯৩৯ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স এর প্রকাশনায় এবং দ্বিতীয় পাঠ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। স্মরণ করা যেতে পারে, ওই একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ের কালজয়ী উপন্যাস— For Whom The Bell Tolls. ১৯৩৬ সালে স্পেনে দক্ষিণ পন্থীদের পরাজিত করে গণতান্ত্রিক জোট 'পপুলার' ফ্রন্ট সরকার গঠন করলে নাৎসি জার্মানি এবং ফ্যাসিস্ট ইতালির মতদপুষ্ট স্পেনের ফ্যাসিবাদী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনের ফ্যাসিবাদী শক্তি 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারকে উৎখাত করে স্পেনে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্রভাবে অভিযান করলে স্পেনের ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনগণ গণপ্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। স্পেনের এই গণপ্রতিরোধ যুদ্ধের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেন পৃথিবীর প্রগতিশীল লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট কর্মীগণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে পৃথিবীর মানবিক বিবেকের কাছে আবেদন জানান। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে স্পেনের ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে বহু বীরের আত্মত্যাগ সত্ত্বেও স্পেনের ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধ ব্যর্থ হয়। স্পেনের এই ঐতিহাসিক জনযুদ্ধের বীরদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই এবং আত্মত্যাগের কাহিনিকে বিষয় করে হেমিংওয়ে রচনা করেন তাঁর ক্লাসিক উপন্যাস—For Whom The Bell Tolls উল্লেখ্য, ১৯৪০ সাল থেকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যেও কমিউনিস্ট বিরোধী ফ্যাসিস্ট প্রবণতা সংক্রমিত হয়। ১৯৪২ সালে ৮ মার্চ, প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদীরা শ্রমিকনেতা ও প্রগতিশীল লেখক সোমেন চন্দ্রকে নৃশংসভাবে খুন করে। সোমেন চন্দ্রকে হত্যার প্রতিবাদে প্রগতি লেখক সংঘ, বাংলা শাখা যে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তার অন্যতম সংগঠক সদস্য।

অতীতের সুনির্দিষ্ট সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর লেখা হেমিংওয়ের For Whom The Bell Tolls টাইপোলজিকালি একটি diachronic construct বা নির্মাণ। ১৯৪০ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন বাংলার একটি বিশেষ সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজ রূপান্তরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর লিখিত, 'সহরতলী' উপন্যাস একটি synchronic নির্মাণ। এই ডায়াক্রনিক এবং সিনক্রনিক শব্দদুটি বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর তাঁর ভাষাতত্ত্বের গবেষণা গ্রন্থ, কুর দ্য লিংগুয়িস্তিক জেনেরাল-এ (Cours de Linguistique Generale) ভাষার ক্রমবিকাশ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য, সমাজের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে আখ্যানের রূপও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। সোস্যুর তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন ভাষায় প্রধান দুটি দিক— (১) langue বা শব্দার্থ, বাক্যগঠন, বাগধারা গঠনের সুসম্বদ্ধ ব্যবস্থা যা সামাজিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সমষ্টি চেতনার মধ্যে সঞ্চিত হয়। (২) Parole বা কথন, উক্তি বা Speech, উচ্চারণ। এই langue এবং Parole-এর মিথস্ক্রিয়ায় ভাষার মধ্যে বিভিন্ন তাৎপর্য স্থাপন বা অর্থ প্রকাশের সুসম্বদ্ধব্যবস্থা (signifying system) গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে ভাষার বিন্যাস এবং ব্যবহার বিভিন্ন বিশেষত শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ভাষার signifying system শ্রেণিগত ভাবে নির্ধারিত হয়, বিষয়ী (signifier) এবং বিষয়ের (signified) দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সমাজে এবং রাষ্ট্রে বিষয়ীর অবস্থান আধিপত্যের অবস্থান, বিষয়ের অবস্থান অধীনতার অবস্থান। জাঁ পল সাত্র তাঁর 'সাহিত্য কী' গ্রন্থে বলেছেন— একজন লেখক তাঁর শ্রেণিগত অবস্থান থেকেই লেখেন এবং তাঁর শ্রেণির জন্য লেখেন, শ্রেণি নিরপেক্ষ প্রেক্ষিত আসলে সোনার পাথরবাটি। যাই হোক, সোস্যুরের ভাষা তাত্ত্বিক গবেষণা, উপন্যাসে সামাজিক রাজনৈতিক ব্যাখার পদ্ধতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলী' উপন্যাসকে বুঝতে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করতে সোস্যুরের গবেষণা সহায়ক হবে।

'সহরতলী' উপন্যাস আলোচনার জন্য উপন্যাস ব্যাখ্যার বিখ্যাত তাত্ত্বিক মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখটিনের chronotope তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। বাখটিন chronotope -এর সাধারণ সরল অর্থে বুঝিয়েছেন স্থান এবং কালের মাত্রা। তাঁর মতে, The image of man is always intrinsically chronotopic, যদিও বাখটিন স্থান এবং কালের সাযুজ্যকে উপন্যাসের ধরন এবং শৈলীগত সুসংহতি সংস্থাপনের জন্য সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, তবুও উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতা উপস্থাপনে class determinant কে এড়িয়ে যেতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'The process of assimilation and appropriating real historical time and space in literature and particulary in novel are bound to be different as novelists take different social positions, points of view according theri different class positions and socio ideological cognitiv processes. An individul novelist becomes distinctive in devising his generic technic and artstic approach to process appropriation of social reality' বাখটিন স্থান এবং কালের তুলনামূলক আলোচনার সামাজিক স্থান বা Social Space কে বেশি গুরুত্ব দিয়েচেন কারণ একটি সামাজিক ক্ষেত্রে ঘটনার পর্যায়ক্রমের মাধ্যমে সময়ের অগ্রগতিকে চিহ্নিত করা যায়। বাখটিন সংগত কারণে বলেন, 'The chronotope is the place where the knots of narrative are tied and united'. সময় এবং সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়াও বাখটিন সামাজিক ভাষা বৈচিত্র্য বিশেষত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের মধ্যে বাস্তব সামাজিক কথন বৈচিত্র্যের (concrete social speech diversity) ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'Every languuage in novel is a point of view, a socio ideological conceptual system of real social groups and theri embodied representatives.' (The Dialogic Imagination of M M. Bakhtin) বাখটিন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় -এর 'সহরতলী' উপন্যাসটি পড়লে হয়তো তারিফ করে বলতেন, বিষয়ী বিষয়তত্ত্ব এবং chronotopic এবং সামাজিক কথোপকথন বৈচিত্র্যের নিরিখে 'সররতলী' উপন্যাস একটি architype.

বড়ো শহরের উপান্তে অবস্থিত আধাগ্রাম আধা শহর, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বসতি। বহু বৈপরীত্য এবং বৈচিত্র্যে ভরা নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি সামাজিক ক্ষেত্রকে মানিক তাঁর 'সহরতলী' উপন্যাসে আখ্যায়িত করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর নিজের ভাষায় এই বৈপরীত্যকে চিত্রিত করেছেন— 'পথের দু-পাশে সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগের, রুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের...কত যে আশ্চর্য সমন্বয় ও গলাগলি ভাব! নাম লেখা গেট, বাগান ও লন, আধুনিক ফ্যাশনের সুদৃশ্য দোতলা বাড়ী, বিচিত্র শাড়ী, সুন্দর নারী, রেডিওর গান। ইট বাহির করা পুরানো একতলা বাড়ী, রোয়াকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা, আধ-পোড়া বিড়ি, কোমরে ঘুন্‌সী বাধা উলঙ্গ শিশু। পথের এক দিকে ছবির মতো সাজানো মনিহারী দোকান— সাবান, কেশ তৈল, পাউডার, স্নো, ক্রিমে ঠাসা। পথের অপর দিকে নিছক একটা কয়লার আড়ৎ, খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়, মালিক শ্রীভূষণ চন্দ্র নন্দী। তিনটি মহিষের গাড়ি কয়লা আনিয়া আড়তে জমা করে। পুরীষ ও পাঁকের কোমল গভীর স্নেহে দেহের ভার নামাইয়া এই তিন জোড়া মহিষ অবসর সময়ে জাবর কাটে। আড়তের ঠিক পিছনে— রাস্তা হইতে অনেকটা চোখে পড়ে, গন্ধও পাওয়া যায় কিছু কিছু। কাছেই ডায়মন্ড রেস্টুর‍্যান্ট, ফাস্ট কেলাশ চা, রুটি মাখন চপ, কাটলেট, ডবল ডিমের মামলেট (মাত্র তিন পয়সা) ইত্যাদি পাইবেন বলিয়া চালার নীচে লোচন সাইয়ের মুড়ি চিড়ার দোকান, কাচ বসানো টিনের পাত্রে বাতাসা, দড়িতে ঝুলানো তিলুড়ি, এক ছড়া চাপাকলা...। ছোটো স্যাকরার দোকান, কামারের দোকান, টিনের মগ বাল্‌তি তৈরী আর ঘটি বাটি ঝালাই করার দোকান, সাইকেল মেরামতি দোকান, এসবও আছে।

'আর কিছু দূরে আছে বড় বড় কারখানা।'

''হাপরের দড়ি টানিতে টানিতে তিনু, রক্তবর্ণ লোহার পাতে হাতুড়ী পিটাইতে পিটাইতে বিশু, আর অবাধ্য লোহার পাতকে মনোমত আকৃতি দিবার চেষ্টা করিতে করিতে বেন্দা যখন হাপাইয়া পড়ে, তখন হয়তো বেন্দাই তাকায় সেই দিকে, যেদিকে আছে বড় বড় কারখানাগুলি। প্রকান্ড একটা লাল দালানের লাগাও বিরাট একটি টিনের আর তিনটি মোটা মোটা চোঙা পরিষ্কার দেখা যায়...কত বিঘা জমি জুড়িয়া না জানি কারখানাগুলি গড়া হইয়াছে! নিবিড় কালো কি ধোঁয়াটাই উঠিয়া যাইতেছে চোঙাগুলি দিয়া আকাশের দিকে। বেন্দা জানে, বিদ্যুতে যেমন কাচের ভেতর অবিরাম শিখাহীন আলো জ্বলে, অমনি অবিরাম কলও চলিতে পারে, সব কল ধোঁয়া ছাড়ে না। কিন্তু ঊর্ধমুখী চোঙা দিয়া যে ধোঁয়া বাহির হয়, বেন্দার কাছে তাই কেবল কারখানার প্রতীক।''

ধনী-দরিদ্রের পাশাপাশি অবস্থানের এই বৈপরীত্যের সামাজিক ক্ষেত্র, শহরতলীর এক প্রান্তে থাকে চাঁদের মা যশোদা। তার ইট আর টিনের ছোটো বড়ো কাচাপাকা ঘরগুলির মধ্যে স্থায়ীভাবে আটকে থাকতে চেষ্টা করে। যশোদার একমাত্র সন্তান চাঁদ শৈশবেই মারা যাওয়ার পর খেটে খাওয়া গরিব মানুষের নিয়েই যশোদার সংসার। গ্রাম থেকে আসা গরিব কৃষক মজুর শহরের প্রান্তিক নিম্নবর্গের লোকদের যশোদা তার ঘরগুলিতে থাকতে দেয়। খোঁজ খবর নিয়ে শ্রমিকের কাজ জুটিয়ে দেয়। যতদিন না-কাজ পায় ততদিন তাদের বিনা পয়সায় খেতে দেয়। প্রতিদিন তার তিনটি উনুন জ্বলে। যশোদার রান্নাঘরটি যেন তার আশ্রিত শ্রমিকদের একটি কমিউনিটি কিচেন। তার আশেপাসের গরিব নিম্ন মধ্যবিত্তদের সঙ্গে যশোদা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। তার আশ্রিত মজুরদের সমস্ত হীনম্মন্যতা দূর করে পৌরুষ জাগিয়ে তোলে। যশোদার নেতৃত্বে শহরতলির কারখানার শ্রমিকরা জোট বাঁধে শ্রমিক ছাঁটাই হলে ধর্মঘট করে। ছাঁটাই শ্রমিকদের অন্যত্র কাজ জুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

যশোদার জীবন যাপন গতানুগতিক নয়— একটু খাপছাড়া জীবন যাপন করে বৈকি যশোদা, একটু অনন্যসাধারণ হয় বৈকি তার রীতিনীতি চালচলন, কিন্তু খুব বেশি বেমানান যেন তার পক্ষে হয় না। এরকম অবস্থায় অন্য কোনো স্ত্রীলোক হয় পুরুষের আশ্রয় খুঁজিত, নয় মানুষের মতবাদ ও নির্দেশের চাপে ধ্বংস হইয়া যাইত, যশোদা কিছুই করে নাই। জীবন যাপন করে সে স্বাধীন। কারও কাছে তার কোনো প্রত্যাশা নাই, নিন্দা, প্রশংসা সে গ্রাহ্য করে না, কারও দরদের জন্য সে কাঁদিয়া মরে না। বিপাকে আপদে তারই কাছে মানুষ উপকার পায়। পুরুষের কাছে যে কাজ পাওয়া কঠিন, যশোদার কাছে তাই পাওয়া যায়। শহরতলির কুলি মজুর সহ সমস্ত সাবলটার্ন মানবীরা যশোদার মাধ্যমে বিষয়ী বা signifier এর অবস্থান এসে সামাজিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে। যশোদার কণ্ঠে ফুটে ওঠে পুরুষতন্ত্রের উচ্চ বর্গের মানুষদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিশেষত, সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীর মতো কারখানা মালিকদের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ ক্ষোভ এবং বিদ্রোহ। যশোদা ভীরু কাপুরুষ অসল পুরুষ মানুষকে সহ্য করতে পারে না, বিশেষত কাপুরুষ মেরুদণ্ডহীন গরিব নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, যারা গরিব কৃষক মজুরদের থেকে দূরত্বে থেকে বড়োলোক ঘেষা হয়ে থাকতে চায়। এদের সম্পর্কে যশোদার মনোভাব— ''ভদ্রলোক নাকি বড়ো বেশি ছোটোলোক যারা পুরা ভদ্রলোকও নয় খাঁটি ছোটলোকও নয়, তারা নাকি একটা অদ্ভুত অপদার্থ জীব। তার চেয়ে কুলি মজুর ভাল। ...কেমন যেন চালচলন ওদের, কেমন যেন ভাল- মন্দ পাপপুণ্যের হিসাব, কোকেনখোরদের মত। মা বোন যখন খাইতে পায় না, বউ যখন জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে রান্না করে, পথ্য না দিয়া ছেলেকে কেবল ওষুধ খাওয়াইতে ডাক্তার যখন বারণ করিয়া দেন, তখনও সকলের কথা ভুলিয়া গিয়া বাহিরের পুরুষ মানুষের স্ফূর্তি করিবার ব্যাপারটা যশোদা বুঝতে পারে। কিন্তু তখন দুশ্চিন্তায় মুখ পাংশু করিয়া কপাল চাড়ড়াইতে চাপড়াইতে অদৃষ্টকে গালি দিয়া চকচকে জুতাটি পরিয়া চুলে সিঁথি কাটিতে দেখিলে যশোদার রক্তে আগুন ধরিয়া যায়।'' নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাবুদের এই আসল চেহারা বাবুরা হয়তো বুঝতে পারে না কিন্তু সাবলটার্ন যশোদার চোখ দিয়ে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই। তবুও মমতাময়ী যশোদা তার গরিব প্রতিবেশীদের মতো জ্যোতির্ময়ের মতো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নেয়, সুখ দুঃখের সঙ্গী হয়। জ্যোতির্ময় শিল্পপতি সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীর প্রচার বিভাগের কলম পেষা মজুর। তার আসল কাজ, সত্যপ্রিয়ের নাম ও মত প্রচার কার এবং নতমস্তকে মালিকের তালিম করা।

যশোদার হঠাৎ চোখ পড়ে 'সহরতলীর' চেহারা দ্রুত পালটে যাচ্ছে। অসচ্ছল পরিবারদের কাঁচাপাকা পুরানো বাড়ির জায়গায় উঠছে ঝকঝকে ধনীর প্রাসাদ। শহরতলির সামাজিক ক্ষেত্রটি ক্রমশই উচ্চ বর্গের বিত্তবানদের দখলে চলে যাচ্ছে। দেশে এই সময় জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল। একই সঙ্গে নিঃশব্দে প্রসারিত হচ্ছিল বুর্জোয় জোতদারদের আধিপত্যের

এলাকা। শহরতলির এলাকারও এই প্রক্রিয়া অধিকতর প্রকট রূপে দৃশ্যমান। ভারতীয় বুর্জোয়ারা বুঝতে পারছিল, জাতীয় স্বাধীনতা এলে ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসবে। ভারতীয় বুর্জায়া জমিদার জোতদারগণ জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য অকমিউনিস্ট দলের মধ্যে বৈষম্যমূলক সামাজিক অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি তাদের স্বার্থাভিমুখী করে ধরে রাখার সুপরিকল্পিত প্রয়াস গ্রহণ করেছিল। জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের কর্মসূচির মধ্যে শ্রমিক, গরিব কৃষক খেতমজুর এবং নিপীড়িত নিম্নবর্গের জনগণের নিপীড়ন শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির কোনো দিশা বা অ্যাজেন্ডা না-থাকায় এই সব কোণঠাসা মানুষদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া জাগাতে পারেনি। ভারতীয় বুর্জোয়া জোতদারগণ শাসক বিরোধী আন্দোলনকে চল্লিশের দশকে উৎসাহ দেয়নি। শহরতলির বহু মিল ও কারখানার মালিক সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী চরিত্রটি তৎকালিন ভারতীয় বুর্জোয়াদের প্রোটাগনিস্ট। সে তার মতো প্রচারের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রচার বিভাগ খুলেছিল। শহরতলির সামাজিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার জন্য পাড়ার ছেলেদের 'মডার্ন' ক্লাব ও লাইব্রেরিকে পাঁচশো টাকা দান করে সভাপতি হয় এবং প্রতিষ্ঠা দিবসে যুবকদের উপদেশ দেয়— 'আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মতো বাজে গোঁয়ার্তুমি ভুলিয়া গিয়া, বড় কিছু করা আর বড় কিছু হওয়ার মরীচিকাকে প্রশ্রয় না দিয়া, ভবিষ্যতে যাতে কোন রকমে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকা যায় প্রথম বয়স হইতেই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্তব্য।'

সত্যপ্রিয় এক পত্রিকায় প্রকাশিত 'তেত্রিশ বৎসরে ভারতে স্বাধীনতা লাভের উপায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখে—'ভারতবর্ষের যে অধঃপতন হইয়াছে, ভারতবাসীর যে দুরবস্থা দেখা দিয়াছে এবং দিন দিন অধঃপতন দুরবস্থা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ভারতবাসীর রাজশক্তির সহিত বিবাদ। ...যে মুহূর্তে ভারতবাসী রাজশক্তির সহিত বিরোধ পরিত্যাগের চেষ্টা আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্ত হইতে ধর্ম ও সমাজের অধোগতি রদ হইয়া দেশবাসীর অন্ন কষ্ট, সুখ-শান্তির অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এ সমস্তের প্রতিকারও আরম্ভ হইবে—বিশ বৎসর পরে দেখা যাইবে, একমাত্র পরাধীনতা ছাড়া ভারতবর্ষের কোন অভাব নাই।' 'সত্যপ্রিয়ের একান্ত অনুগত জ্যোতির্ময়ের কাছেও প্রবন্ধটি প্রলাপের মতো মনে হয়। সে ভাবে, 'সত্যপ্রিয়ের বলিবার যেন কিছুই নাই। সে শুধু ধর্মঈশ্বর, শাস্ত্র, দেশ ও সমাজের দোহাই দিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতার প্রচলিত আন্দোলন বন্ধ করিতে বলিতেছে।'

সত্যপ্রিয় কত বড়ো খল দেশপ্রেমিক, তার উক্তিতেই তা পরিস্কার বোঝা যায়। তবুও সত্যপ্রিয় বিভিন্ন সাময়িকীতে লেখে বিজ্ঞাপন বাবাদ প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে। কিন্তু কিছু পত্রিকা আছে যাদের টাকা দিয়েও বশ করা যায় না। সত্যপ্রিয়ের অনেক রকম মুখোশ। মুখোশের আড়ালে আসল মুখটি যে কত ক্রুর, কত নির্মম, মুখোশের ছলাকলার অনেকেই তার আসল রূপটি বুঝতে পারে না। সে পরিস্থিতি অনুযায়ী পোশাক বদলায়। কখনও হ্যাটকোট পরা সাহেবি পোশাক, কোনো সময় মাথায় টুপি গায়ে লম্বা কোট, কোনোদিন পাঞ্জাবি কোঁচানো ধুতি, কাঁধে ভাঁজ করা চাদর, বাঙালি পোশাক বাড়িতে কীর্তনের আসর বসিয়ে, হাঁটুর ওপর গরদের কাপড়, কাঁধে মোটা পইতা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী সেজে তার বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে আসা যশোদাকে দর্শন দেন। তার নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর রূপ দেখে যশোদা পর্যন্ত প্রভাবিত হয়ে সন্ন্যাসীর ভেকধারী সত্যপ্রিয়কে প্রনাম করে বসে। আদতে যশোদাকে সত্যপ্রিয় 'সহরতলিতে' তার পয়লা নম্বর শত্রু বলে মনে করে, কারণ যশোদার প্রেরণায় এবং নেতৃত্বে তার কারখানার শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট করে। যশোদার মাধ্যমে আপস করে। কিছু শ্রমিকের ছাঁটাই এবং বিনিময়ে শ্রমিকদের কিছু দাবি মেনে নিয়ে ধর্মঘটের নীমাংসা হয়। শ্রমিকরা এই 'আপস' মেনে নিয়ে ধর্মঘট তুলে নেয়। সত্যপ্রিয় চক্রান্ত করতে সক্ষম হয়। তখনকার শ্রমিক সমিতি যশোদার নামে বন্ধুরূপী শত্রু বলে কুৎসা চালায়। এই শ্রমিক সমিতির মধ্যে সত্যপ্রিয়র লোক ছিল।

সত্যপ্রিয়ের চক্রান্তের জাল বহুদূর বিস্তৃত। সে জানে শহরতলিতে কুলি মজুর গরিব নিম্নবর্গের মানব মানবীর মধ্যে যশোদার প্রভাব আছে। তাছাড়া যশোদার লিডারশিপ পোটেনশিয়াল সম্পর্কে সত্যপ্রিয় অত্যন্ত শঙ্কিত। ভবিষ্যতে যশোদা যাতে শ্রমিক গরিব নিম্নবর্গের মানুষদের পুনরায় সংগঠিত না - করতে পারে তার জন্য যশোদা এবং তার প্রভাবিত লোকজনদের এলাকা থেকে উৎকাত করার চক্রান্ত শুরু করে। যশোদা লক্ষ করে শহরতলির দ্রুত রূপান্তর। চারদিকে অসংখ্য হালফ্যাশানের পাকা বাড়ি উঠছে। দোকান পাট বাড়ছে। বাজারের সংস্কার হচ্ছে। জমির দাম এত বেড়ে গেছে যে বড়োলোক ছাড়া শহরতলিতে আর কেউ বাস করতে পারবে না। মোটা টাকার লোভে অনেকে বাড়ি জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। কিন্তু যশোদা রুখে দাঁড়ায়। যশোদার জন্য তার এলাকায় কেউ বাড়ি বিক্রি করতে পারছে না। যশোদার প্রতিবেশী কুমুদিনী যশোদাকে বাড়ি বিক্রি করার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু যশোদা তার অবস্থানে দৃঢ়সঙ্কল্প— 'সত্যপ্রিয় কিনে নিচ্ছে তো ঘর বাড়ি— ওকে আমি বেচবো না লাখ টাকা দিলেও নয়।...লোকটা আমার ঘর ভেঙেছে আমার বদনাম রটিয়েছে, ওকে আমি বাড়িঘর বেচবো? সবাই কত ভালোবাসতো আমায়, এখন একজন আসে দেখিস আমার কাছে? কত করেছি ওদের জন্য আমি, আজ ওরা আমায় বলছে, সত্যপ্রিয়র লোক, সত্যপ্রিয়র টাকা খেয়ে ওদের বন্ধু সেজে ওদের সর্বনাশ করেছি?' শ্রমিকদের নিয়ে যে সংসার যশোদা গড়ে তুলেছিল সে সংসার সত্যপ্রিয় ভেঙে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সত্যপ্রিয়র মতো ধনী মালিকের নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী শ্রমিক শোষণ এবং শাসনের বিরুদ্ধে যশোদা যেভাবে সত্যপ্রিয়র একটি কারখানার অসংগঠিত শ্রমিকদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ করেছিল তা বিফল হয়নি। যশোদার অনুপস্থিতিতে এবং সত্যপ্রিয়র চক্রান্তে শ্রমিক আন্দোলন বেহাল হয়। অতঃপর বিখ্যাত শ্রমিক নেতা বিধুবাবু এসেই যশোদার ভাবমূর্তির গুরুত্ব অনুধাবন করে যশোদার বাড়িতে এসে তাঁর কাছে আবেদন জানায়— ''আগের কথা ভুলে যাও দিদি, তোমাকে আমাদের চাই।'' বিধুবাবুর সঙ্গে আলোচনায় যশোদা বুঝতে পারে বিধুবাবুদের মতো লোকদের কোনো স্বার্থপরতা নেই। বিধুবাবু যশোদাকে সসম্মানে শ্রমিক সমিতির সভায় নিয়ে যায়।

শ্রমিক সমিতির আলোচনা সভায় বক্তাদের অনেক কথাই যশোদা বুঝতে পারলেও সামগ্রিক আলোচনা থেকে তার নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে এবং বিধুবাবুদের সম্পর্কে এক নতুন চেতনায় আশ্বস্ত হয়— 'এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্কবিতর্ক বুঝিবার মতো জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মতো ঠেকনো দিয়ে দশবিশজন শ্রমিককে কোনরকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিকতন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে

সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা এদের কাজ।' 'যশোদা বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের খোঁজে আসা বিচ্ছিন্ন মজুরদের ভালোবাসা দিয়ে মমতা দিয়ে একটা বৃহৎ পরিবারে একত্রিত করে অনেকটা কমিউনের মতো একটা human collective এ পরিণত করার বাস্তবভূমি তৈরি করেছিল। কিন্তু তারা যে একটা শ্রেণি, এ ভাবনা তার ছিল না। বিধুবাবুদের মতো শ্রমিকনেতাদের নেতৃত্বে শ্রমিক সমাবেশে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা শুনে যশোদা বুঝল, শ্রমিকদের শ্রেণি-চেতনায় সংঘবদ্ধ করা কত প্রয়োজন। কিন্তু এর প্রস্তুতি পর্বের প্রাথমিক কাজটা যশোদার মতো নারীরাই সম্পন্ন করতে পারে।

'সহরতলী'তে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঠিকরে আসা মানবমানবীদের মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করে যশোদা যে মানবিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে বিশেষত তাকে কেন্দ্র করে যে মানবী পরিসর (woman spece) গড়ে ওঠে সেখানে পুঁজিপতি সত্যপ্রিয় যশোদার কাছে পরাজিত, কারণ পুঁজিপতিরা কোনো প্রকৃত মানবিক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে না। তারা মানুষকে পণ্য করে, wage slave এ পরিণত করতে পারে মুনাফার লোভে অনেক নীচে নামতে পারে। সত্যপ্রিয় তার অনুগত প্রচার বিভাগের কর্মচারী জ্যোতির্ময়ের বিয়েতে নববধূকে চকচকে সোনার হার উপহার দেয়, পরে দেখা যায় হারটা নকল সোনায় গড়া। চাকরি যাওয়ার ভয়ে জ্যোতির্ময় তার স্ত্রীকে নকল সোনার ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলে। টাকার জোরে ক্ষমতার দম্ভে সত্যপ্রিয় ভাবে সবাইকে বশে রাখতে পারবে। কারখানায় সে যেমন অত্যাচারী মালিক তেমনি তার পরিবারের সে একজন স্বৈরাচারী পেট্রিয়ার্ক। তার মতামত এবং নির্দেশের বিরুদ্ধে গেলে তার মেয়েকে এবং তার আশ্রিত জামাইকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দেয়। সহায়হীন হয়ে তার মেয়ে জামাই যশোদার বাড়িতে আশ্রয় পায়।

সত্যপ্রিয়ের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে যশোদার আশ্রিত শ্রমিকরা যশোদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে যশোদা ভেবেছিল আবার শ্রমিকদের নিয়ে নতুন করে সংসার করবে। কিন্তু ইতোমধ্যে যশোদার পাড়ার চেহারা পালটে যায়। বিত্তবানদের ঘর তৈরি হয়। নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা এই সব পাকা ঘরবাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসে। বিত্তবানদের পাড়ায় খেটে খাওয়া মজুর আসতে চায় না দেখে যশোদার একান্ত সুহৃৎ প্রতিবেশী, রাজেন একদিন যশোদার জন্য নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের খুব কমবয়সি এক দম্পতিকে ভাড়াটে হিসেবে নিয়ে আসে। মেয়েটির নাম সুব্রতা এবং ছেলেটির নাম অজিত। হাসিখুশিতে প্রাণোচ্ছল ষোলো বছরের সরল মনের মেয়ে সুব্রতা অজিতের সামনেই বলে দেয়, এতগুলো পাশ করেও তার স্বামী অজিত কুলি- মজুরের কাজ নেওয়ায় অজিতের দাদা ওদেরকে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। হাসিমুখে সহজভাবে সে যশোদাকে বলে— 'খেটে খেলে লোকের মাথা হেঁট হর্বার কি আছে বলুন তো দিদি?' সুব্রতার কণ্ঠে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত এই প্রশ্ন ভদ্রলোক মানসিকতা — ভদ্রলোকের কাজ, কুলিমজুরের কাজ— শ্রমের জাতপাতের ভিত্তিতে এই দ্বিবিভাজন (Dichotomy) কে শুধু উদ্‌ঘাটিত করে না, তথাকথিত ভদ্রলোক আধুনিকতাকেও Problematic করে তোলে।

সুব্রতা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হলেও উপরোক্ত ভদ্রলোক মানসিকতা তার নেই। সে মুক্তমনা মানবী মানব দরদি। সে কয়েক দিনের মধ্যে যশোদাকে আপন করে নেয়। যশোদাও তাকে কখনও সখীর মতো কখনও মেয়ের মতো বুকে টেনে নেয়। সুব্রতার সংস্পর্শে এসে যশোদা বুঝতে পারে সুব্রতা, অজিত, রাজেনের মতো ব্যক্তিরা নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র ঘর থেকে এলেও তারা ঠিক তথাকথিত ভদ্রলোক নয়। ওরা কুলি - মজুরকে ওদের মতো মানুষ বলে গণ্য করে। যশোদার সাবলটার্ন দৃষ্টিতে ভদ্রলোকেরা চাষা মজুরকে ঘেন্না করে, বড়োলোকের পা চাটে,...খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যতবড় অপমান হোক দিব্বি সয়ে যায়...। যশোদার বিচারে সত্যপ্রিয় অমানুষ, মানুষরূপী দৈত্য।

মমতাময়ী যশোদার প্রেরণায় এবং সুব্রতার উদ্যমে যশোদার বাড়িতে দুপুর বেলায় মেয়েদের একটা মজলিশ বসে যায়। গৃহকোণে বন্দিনী গৃহবধূরাও যশোদাকে কেন্দ্র করে আলাদা আড্ডা জমিয়ে তোলে। যশোদা লক্ষ করে 'ভদ্রলোক নামে যে একশ্রেণির মানুষ আছে তাদের পুত্র কন্যা প্রসব করিয়া আর সংসার চালাইয়া মাঝ বয়সেই সে সব গিন্নিদের দেহ, মন, মুখ, এমনকি শাড়ির আচল আর ব্লাউজ সেমিজ পর্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে... তার বাড়িতে আসিয়া তার ঘরে বসিয়া তার চোখের সামনে পাড়ার এতগুলি স্ত্রীলোক নিজেদের শ্যাওলাধরা জীবন মেলিয়া ধরে আর উপেক্ষা, অবহেলা বা বিতৃষ্ণার বদলে যশোদার মনে জাগে মমতা।' ভাবে এরাও তো মানুষ।' নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের এই সব মানবীরাও সমাজে একদিক দিয়ে অবহেলিতা, কোণঠাসা। যশোদা খেটে খাওয়া নিম্নবর্গের মানবমানবীদের মতো এদের পাশেও দাঁড়ায়। বিপদে পড়ে সত্যপ্রিয়র মেয়েজামাই তাঁর কাছে এলে যশোদা তাদেরকে সাদরে আশ্রয় দেয় এবং তার ফলে প্রতিহিংসাপরায়ণ সত্যপ্রিয় প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে যশোদার বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা হবে বলে প্রশাসন যশোদাকে বাড়ি জমি অধিগ্রহণের নোটিশ ধরিয়ে দেয়। অবশেষে শহরতলির সর্বস্তরের দুঃস্থ মানুষের বন্ধু, আশ্রয়দাত্রী, চাঁদের মা, যশোদা তার বাড়ি থেকে উৎখাত হয়। বাড়ি ছাড়ার প্রস্তুতির সময় সুব্রতা ছলছল চোখে যশোদার কাছে এসে বলে 'তোমায় আর আমি ছাড়ছি না দিদি, মরে গেলেও না— যেখানেই যাও তুমি, আমি তোমার সঙ্গে যাবোই যাব।' না যশোদা ব্যর্থ নয়, সংগ্রামী যশোদার পরম্পরা চলতে থাকবে সুব্রতার মতো মানবীদের মধ্যে। এই catharsis, মানবিকতার শক্তি সম্পর্কে গভীর আস্থা এবং আশাবাদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহরতলী আখ্যানের সমাপ্তি টেনে দেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলী' উপন্যাস ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক সময়ে রচিত হয়। এই সময় ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অনেকগুলি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়— সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, আন্দোলনে অহিংস অথবা সহিংস সংগ্রাম, আপসকামী অথবা আপসহীন সংগ্রাম। সবচেয়ে বড়ো দ্বন্দ্ব ছিল বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমন কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক এবং কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় বুর্জোয়া এবং জমিদার জোতদার শ্রেণি শঙ্কিত হয়। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং ১৯৪২ সালের জুলাই পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকে। এতৎসত্ত্বেও কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় থাকে। তাঁরা ভারতের প্রগতিশীল এবং মানবতাবাদী লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৩৬ সালে নিখিলভারত প্রগতি লেখক

সংঘ এবং ১৯৩৭ সালে ফ্যাসিজম ও যুদ্ধ বিরোধী সংঘ গড়ে তোলেন। এই সময় থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে উপন্যাসে সমসাময়িক রাজনীতি এবং সামাজিক জীবন সংগ্রামে তার প্রতিফলনকে চিহ্নিত করেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'বৃহত্তর মহত্তর' গল্পে চরককাটা এবং ব্যক্তিগতভাবে সমাজসেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে তার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন তোলেন। 'অহিংসা' উপন্যাসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস এবং সহিংস প্রতিবাদের জাতীয় রাজনৈতিক বিতর্কের ছায়াপাত দেখা যায়। ১৯৩৯ - ১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'সহরতলী' উপন্যাসের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বে বর্ণিত একটি সামাজিক ক্ষেত্রের বিস্তৃত ক্যানভাসে শ্রমিক ও নিম্নবর্গের মানুষের বিষয়ী (signifrer) দৃষ্টিকোণ থেকে বুর্জোয়া আধিপত্যের ক্রমপ্রসারণ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং 'সহরতলী'র মানুষের প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামে তার প্রভাবকে তন্নিষ্ঠ ভাবে ফুটিয়ে তোলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিকের পূর্বকালীন এবং সমকালীন কয়েকজন বিখ্যাত কথাশিল্পীদের ছোটোগল্পে উপন্যাসে কখনও দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মানবমানবীরা বিষয় (signifiec) হয়ে এসেছে কিন্তু সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতার ঘনত্ব এবং সম্পূর্ণতা বা plenitude আসেনি। কিন্তু মানিকের ছোটোগল্পে উপন্যাসে বিশেষত 'সহরতলী' উপন্যাসে বর্ণিত সামাজিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির দ্বন্দ্বের ফোকাসে শ্রমিক এবং নিম্নবর্গের মানুষদের বিষয়ী রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মানিক শ্রমজীবী চাষি মজুর এবং অন্যান্য নিম্নবর্গের গরিব মানুষদের সাথে একাত্ম (identified) হতে পেরেছিলেন বলেই এদেরকে বিষয়ী করে তুলতে পেরেছিলেন। এই দিক থেকে মানিক অনন্য এবং radical। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, George Gissing - এর 'The Nether World' 'Workers in the dawn', 'The Unclassed' উপন্যাসগুলিতে শ্রমিকদের ভয়াবহ দুঃখ দারিদ্র্য, তুলে ধরেছেন মূলত তাঁর হতাশাসঞ্জাত আবেগ থেকে। সেইজন্য বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক Raymond Williams' Gissing- কে 'The Spokesman of Despari' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তিনি দুঃস্থ শ্রমিকশ্রেণির সাথে একাত্ম হতে পারেনি। Raymond Williams সখেদে মন্তব্য করেছেন — 'Nothing is to be gained from a simple negative identification'।

বলা বাহুল্য, শ্রমিকদের সাথে মানিকের একাত্মতা ছিল সদর্থক। তিনি ছিলেন কলম-পেষা মজুর। কলমপেষা মজুর হিসেবে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি 'সহরতলী' উপন্যাসের আখ্যান উপাদান এবং ideologemes সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে মানিক 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরি গ্রহণ করেন মাত্র পয়ষট্টি টাকা মাসিক বেতনে। বঙ্গশ্রী পত্রিকার মালিক ছিলেন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের কর্তা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। বঙ্গশ্রী পত্রিকায় তাঁর চাকরি দু-বছর সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে মানিক তাঁর বড়দাকে লিখিত এক পত্রে জানান— 'ইহা loosing concern এবং management অত্যন্ত খারাপ। ২বৎসর আমার মাহিনা বাড়ায় নাই, ভবিষ্যতে কোন প্রকার উন্নতির আশা নাই। প্রত্যহ ১০/১২ ঘন্টা করিয়া খাটিতে হইয়াছে।'

পুস্তক প্রকাশন জগতে মুদ্রণ এবং প্রকাশন পুঁজিপতিদের শ্রমিক শোষণ যে কত ভয়াবহ, মানিক একজন কলমপেষা মজুর হিসেবে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন খামখেয়ালিপনাকেই দায়ী করেছেন। প্রকৃত কারণ হল, মানিক বঙ্গশ্রীর মালিকের বশংবদ হতে পারেননি এবং স্বেচ্ছাচারী শ্রম শোষণকেও মেনে নিতে পারেননি। 'সহরতলির' মিল মালিক সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীর ওপর বঙ্গশ্রী পত্রিকা এবং বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মালিকের ছায়াপাত ঘটেছে। সত্যপ্রিয়র মাধ্যমে মানিক তৎকালীন ভারতীয় পুঁজিপতিদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'সরহতলী' উপন্যাসে। ১৯৪০-এর দশকে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, অপরদিকে ভারতীয় বুর্জোয়ার জমিদার শ্রেণির ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকসমাজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং তার সাথে মহিলাদের জোট বাঁধার প্রয়াসের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিলোপনের (historical erasure) বিরুদ্ধে 'সররতলী' উপন্যাস একটি counter narrative।

সূত্র নির্দেশ :

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র— পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশন

২। M. M. Bakhtin- The Dialogic Imagination Four Essys. Translated by Caryl Emersion and Michael Holoquist

৩। Structuralism- John Sturrock
Chapter 1 - Language, Chapter 4 - Literature

৪। Raymond Williams - Culture and Society

৫। মালিনী ভট্টাচার্য - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবন), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশন